মালঞ্চ-১১

আমরা যখন নাহজুল বালাগা অধ্যয়ন করি তখন যে বিষয়টি আমাদেরকে খুব আকৃষ্ট করে তাহলো নৈতিক ব্যাধিগুলোর ব্যাপারে পরিকল্পনা। যাদের এই ব্যাধি আছে তাদের ব্যাপারে আলী (আঃ) হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন যে, এই রোগগুলো এমন যে, যা প্রত্যেক যুগের মানুষকেই শঙ্কিত করে তোলে। ইমাম যেহেতু বিপর্যয়কর এই রোগের মূল কারণগুলো সম্পর্কে জানতেন তাই তিনি এই রোগ থেকে মুক্তি লাভ বা আরোগ্য লাভের উপায়গুলো সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করেছেন। কেননা নৈতিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও জাতির জন্যেই সার্বজনীন এবং সর্বকালীন গুরুত্ববহ একটি বিষয়।প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং দুনিয়াবী চাকচিক্যের মোহে পড়ার ব্যাপারটি কোনো একটি যুগ বা কালের মধ্যেই সীমিত ছিল না বরং সর্বযুগ বা সর্বকালের মানুষই জীবন ও জগতের এই দূষণ ও কোনার বিপদে নিপতিত হয়। ইমাম আলী (আঃ) নাহজুল বালাগাতে এমন ধরনের মুমিন ব্যক্তিদের চিত্র বা স্বরূপকে উজ্জীবিত করেছেন যাঁরা পার্থিব জগতের মোহে আবদ্ধ ছিলেন না। যেমন আবু জর, সালমান, আসহাবে সুফ্ফা। এঁরা ইসলামী উম্মাহর মধ্যে এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ববর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা পার্থিব জগতের মোহ বা দুনিয়াবী প্রতারক ঐশ্বর্যের ব্যাপারে ছিলেন একেবারেই নির্মোহ ও উদাসীন। কিন্তু এই মহান ব্যক্তিত্বদেরই কেউ কেউ রাসূলে খোদার (সা) রেহলাতের দুনিয়াবী শান-শওকতের মোহে এমনভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন যে, মুসলিম সমাজকেই বিচ্যুতির দিকে ধাবিত করলেন। তখন ইমাম আলী (আঃ) মানুষকে সবচেয়ে গঠনমূলক ও প্রভাবশালী অস্ত্র তাকওয়া ও পরহেজগারীতার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তাকওয়া সম্পর্কে তিনি বলেনঃ তাকওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ মনোযোগ দাও ! যা কিছু পরহেজগারীতার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক-সেসব থেকে দূরত্ব বজায় রাখো! পরহেজগারীতার ব্যাপারে নিজেকে সবসময় সতর্ক রেখো ! তোমার দিনকে পরহেজগারীতা দিয়ে শুরু করো। অন্তরকে পরহেজগারীতার চাদরে সজ্জিত করো ! অন্তরের গুনাহগুলোকে পরহেজগারীতা দিয়ে পরিষ্কার করে সেগুলোকে মন থেকে বিতাড়িত করো। মনে রেখো-যারা তাকওয়ার মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে তাদেরকে খাটো করে দেখবে না, আবার পার্থিব জগত যাদেরকে আপাত দৃষ্টিতে বড়ো করেছে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদাবান বলে ভেবো না। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরাত্মার ব্যাপারে যতশীল হয় এবং নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে সে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, সে তো পাপের পথেই যাবে না, বরং তার মনে পাপের চিন্তাই কাজ করবে না। পরহেজগারীতা অন্তরাত্মাকে শক্তিশালী করে এবং অবাধ্য বা উদ্ধত অনুভূতিগুলোকে বশীভূত করে। ইমাম আলী (আঃ) নাহজুল বালাগায় বলেছেনঃ হে আল্লাহর বান্দারা! তোমাদেরকে আল্লাহর পথে, তাকওয়ার পথে আহ্বান জানাচ্ছি যা কিনা কিয়ামতের পথের পাথেয়। পরহেজগারীতা এমন এক পাথেয় যা পরহেজগারীতা ধাবণকারী ব্যক্তিকে তার লক্ষ্যপানে বা মঞ্জিলে নিয়ে যায়। পরহেজগারীতা এমন এক পাথেয় যা বান্দাকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ আশ্রয় দেয়। ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর স্মরণ তাঁর বন্ধুদেরকে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত রাখে এবং তাদের অন্তরগুলোকে আল্লাহর ভয়ে পরিপূর্ণ রাখে। আল্লাহর ভয়ে তারা তাদের রাতগুলো বিনিদ্র অবস্থায় কাটায় আর তাদের দিনগুলো কাটে রোযার কৃচ্ছতার মধ্য দিয়ে।

নিজের ব্যাপারে যতশীলতাকে আলী (আঃ) সর্বপ্রকার নৈতিক মূল্যবোধের মূল ভিত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। কোন ব্যক্তি যদি পবিত্রতা এবং তাকওয়াপূর্ণ জীবনযাপন করে তাহলে সে প্রখর ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিমান হবে। কেননা আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হলে অন্তরের সকল বক্রতা-পঙ্কিলতা ও মনের সকল কালিমা দূর হয়ে যায় এবং মনের গহীনে এক ধরনের পবিত্রতা এসে মনকে নিষ্কলুষ করে তোলে। অন্যভাবে বলা যায়, তাকওয়া মানুষের বিবেক বা প্রজ্ঞায় স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করবার শক্তি দান করে। এ কারণে এটি প্রতিটি মানুষের জীবনেরই অবশ্যম্ভাবী এবং পছন্দনীয় একটি বৈশিষ্ট্য। কেননা সবাই চায় স্বাধীনভাবে চলতে এবং বিবেক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ জীবনযাপন করতে।

তাকওয়া হচ্ছে সততার চাবিকাঠি এবং পরকালীন জীবনের পাথেয়। তাকওয়া হচ্ছে সর্বপ্রকার গোলামি থেকে মুক্তির মূল চালিকাশক্তি এবং সর্বপ্রকার ধ্বংস থেকে মুক্তির উপায়। তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলো সফলতা পায় এবং তাকওয়াবান মানুষ শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি লাভ করে। তাকওয়াবানদের আশা-আকাংক্ষাগুলো পূর্ণ হয়।

আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে পরহেজগারীতার মর্যাদা এতো উচ্চে যে, তাকওয়াবান ব্যক্তি তাঁর শ্রোতাদেরকে একাধারে এই উপদেশ দেয় যে, জামা-কাপড় যেভাবে মানুষের শরীরকে শীত এবং গরম থেকে রক্ষা করে, সেভাবে পরহেজগারীতার মাধ্যমে মানুষ যেন নিজের ব্যাপারে যতশীল হয়ে আত্মনিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আত্মসম্মান-মর্যাদা ও ভালোবাসা অর্জন করে। তিনি বলেনঃ মনে রেখো! তাকওয়া হলো আনুগত্য ও খোদাভীতির এমন এক বাহন যার আরোহীর হাতে রয়েছে লাগাম এবং আরোহী নিজেকে প্রশান্তচিত্তে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়।

মালঞ্চ- (১২)

আলী (আঃ) এর অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি ছিলেন অসীম জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। রাসূলে খোদা (সা) বলেছেন, আমি হলাম জ্ঞানের শহর আর আলী হলো সেই শহরের দরোজা। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারায় সিক্ত হয়ে আছে নাহজুল বালাগা। নাহজুল বালাগা তাই পরিণত হয়েছে জ্ঞানের বিস্ময়কর এক সম্ভারে। এ বিষয়টি নিয়ে মালঞ্চের আজকের আসরে আমরা কথা বলার চেষ্টা করবো।

আমিরুল মুমেনিন আলী (আঃ) এর বক্তব্য-চিঠিপত্র এবং তাঁর বিভিন্ন বাণীতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলোঃ ইসলাম হলো একটি জীবন বিধান এবং ইসলাম আমাদেরকে

মর্যাদাময় ও সম্মানজনক একটি জীবনের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আলী (আঃ) তাই সবসময়ই এ বিষয়টিকে জনগণের সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন মানুষের মন থেকে অজ্ঞতার পর্দাগুলোকে সরিয়ে দিতে এবং মানুষের দৃষ্টিকে আলোর একটি উrস হিসেবে, হেদায়েতের উপাদান হিসেবে জ্ঞানের প্রতি নিবদ্ধ করতে। কুমাইল নামে তাঁর একজন সঙ্গীকে তিনি বলেছেনঃ হে কুমাইল! জ্ঞান হলো ধন-সম্পদের চেয়ে উত্তম। কারণ জ্ঞান হলো তোমার পাহারাদার, আর তুমি হলে মালের পাহারাদার। মাল থেকে দান করার ফলে মালামাল হ্রাস পায় কিন্তু জ্ঞান দান করার ফলে জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পায়। তাই যে সম্মান বা মর্যাদা মালের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, মাল চলে গেলে সেই সম্মান ও মর্যাদাও হারিয়ে যাবে।

ইসলাম হলো একটা মৌলিক ও বাস্তববাদী ধর্ম। সেজন্যেই ইসলামের আবির্ভাবের ফলে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞানরাজ্যে নতুন এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অযৌক্তিক রীতি-আচার ও সংস্কৃতির বেড়াজাল থেকে মানুষের মন ও চিন্তা স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছে। এটা ইসলামের অবদান। ইসলাম মানুষকে সত্য আবিষ্কারের দিকে আহ্বান জানিয়েছে। ইমাম আলী (আঃ)ও অন্ধ অনুসরণ, নাফরমানী, একগুঁয়েমিকে সত্যান্বেষী মনের পরিপন্থী বলে মনে করতেন এবং তাকে নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বরং জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও চিন্তাশীলতার দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে প্রকৃত মুসলমান জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে কখনোই অসহিষ্ণু হয় না। তিনি আরো মনে করেনঃ জ্ঞান অর্জনের কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই কিংবা নেই কোনো স্থানিক পরিসীমা। তিনি বলেনঃ জ্ঞান হলো মুমিনের হারানো সম্পদ, সুতরাং কোনো কপট লোকের কাছ থেকে হলেও জ্ঞান আহরণ করো। সমৃদ্ধ ইসলামী সভ্যতা ও মুসলমানদের জ্ঞানের বিকাশ কেবল কোরআনের আলোকিত শিক্ষা এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর অনুপ্রেরণা থেকেই উrসারিত। কেননা ইসলাম প্রতিটি মুসলিম নরনারীর ওপর জ্ঞানার্জন করাকে ফরয বলে ঘোষণা করেছে। আলী (আঃ) এরই ভিত্তিতে বহুবার বলেছেন যে প্রতিটি মানুষের মর্যাদা নির্ভর করছে তার জ্ঞানের পরিমান বা পরিধির ওপর।

ইমাম আলী (আঃ) নিজেকে এমন একজনের প্রতি বিনয়ী বলে মনে করেন যিনি তাঁকে অন্তত একটি শব্দও শিখিয়েছেন। তিনি ভবিষ্যr প্রজন্মের জাগৃতির জন্যে এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্যে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে ভীষণ তাগাদা প্রদান করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ যে-কোনো

পাত্রেই কিছু ঢাললে এক সময় তা পূর্ণ হয়ে যায় কেবল জ্ঞানের পাত্র ছাড়া, কেননা তাতে যতোই ঢালা হয়, তার পরিধি ততোই বেড়ে যায়। অবশ্য সেই জ্ঞান তখনি আলো ছড়ায় যখন তা মানুষকে নিজস্ব কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা এবং স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি দেয়।

বহু জ্ঞানী লোক আছে যারা আত্ম-অহংকারের বেড়িতে আবদ্ধ হয়ে আছে এবং ধন-সম্পদ আর শক্তি-সামর্থ অর্জনের খেলায় মেতে রয়েছে। এ কারণেই মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এবং জ্ঞানকে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া সবসময়ই ছিল দ্বন্দ্বমুখর। আলী (আঃ) এর নাহজুল বালাগা জ্ঞানের জগতে আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি মানুষকে শিক্ষার যথার্থ পথ দেখিয়েছে এবং সত্যিকারের জ্ঞানী যারা তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ইমাম আলী (আঃ) নবীজির আহলে বাইতকে জ্ঞানের প্রোজ্জল বাতি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ তাদের অর্থাr আহলে বাইতের কাছ থেকেই পরিত্রাণের উপায় সন্ধান করো, নবীজীর আহলে বাইতের কাছেই রয়েছে জ্ঞানের আসল রহস্য এবং অজ্ঞতার আঁধার দূর করার গোপন চাবিকাঠি।

মালক্ষ-১৩

গত আসরে আপনারা জ্ঞান সম্পর্কে ইমাম আলী (আঃ) এর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য শুনেছেন। জ্ঞানকে তিনি কতোটা মর্যাদার সাথে উচ্চাসনে স্থান দিয়েছেন সে সম্পর্কেও খানিকটা অবহিত হয়েছেন। আজকের আসরে জ্ঞান-ঈমান এবং আমল সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

ইমাম আলী (আঃ) এর বক্তব্য দিয়েই শুরু করা যাক আজকের আসর। তিনি বলেছেনঃ হে মানুষেরা! আমাকে হারাবার আগেই যা কিছু জানার আছে প্রশ্ন করে জেনে নাও! নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর বিষয়াবলীর চেয়ে আকাশের বিষয়াবলী সম্পর্কে ভালো জানি। মানুষ যতোই জ্ঞান ও সত্যের ব্যাপারে বেশি বেশি সচেতন হবে, ততোই অন্যের অজ্ঞতায় কষ্ট পাবে এবং তাদের হেদায়েতের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন হবে। আলী (আঃ) জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে নজিরবিহীন একজন মানুষ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞানের উপায়গুলো তুলে ধরেছেন। মূর্খকে তিনি দিশেহারা বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলে মনে করেন। আবার জ্ঞানী ব্যক্তিকেও তিনি কেবল জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে ফিরিয়ে রাখার

পক্ষপাতী। কেননা যেসব মানুষ সত্যান্বেষী এবং জ্ঞানপিপাসু, তারা অনেক সময় আত্মপূজারী ও পদ-মর্যাদাকাঙ্ক্ষী হয়।

আলী (আঃ) তাই জ্ঞানের পাশাপাশি ঈমানকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন। তার কারণ জ্ঞান এবং ঈমান মানুষের ভবিষ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে বিচিত্রমুখী ভূমিকা রাখে। জ্ঞানের ভূমিকাটা হলো এটা মানুষকে যোগ্যতা ও সক্ষমতা প্রদান করে এবং উন্নতি ও অগ্রগতির পথগুলোকে উন্মুক্ত করে দেয় যাতে মানুষ যেভাবে চায় সেভাবেই নিজের ভবিষ্য গড়তে পারে। কিন্তু ঈমান মানুষকে হেদায়াত দান করে যাতে সে তার ভবিষ্যকে পুণ্য ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলে। আলী (আঃ) বলেছেনঃ ঈমান হলো সুস্পষ্টতম পথ এবং সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল বাতি। ঈমানের সাহায্যে পুণ্য ও নেক আমল করা যায় আর নেক আমলের সাহায্যে ঈমানের নাগাল পাবার সামর্থ তৈরি হয়। ঈমানের সাহায্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আরো বেশি দীপ্তিমান হয়।

বর্তমান বিশ্বের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বা জ্ঞানী-গুণী মনীষী স্বীকার করেছেন যে জ্ঞানের পাশাপাশি ঈমানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জর্জ শার্টেন ছয় ডানা নামক গ্রন্থে মানুষের সম্পর্ককে মানবীয় করণ করার জন্যে জ্ঞান ছাড়াও আরো একটি উপাদানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ শিল্প সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে, সেজন্যে শিল্প মানুষের জীবনের আনন্দ ও সুখের উস হিসেবে কাজ করে। আর ধর্ম প্রেম নিয়ে আসে, এ অর্থে দ্বীন হলো জীবনের সঙ্গীত। জ্ঞানও মানুষের সচেতনতার উস। এই তনটি জিনিসই আমাদের জন্যে প্রয়োজন। একটি হলো শিল্প, আরেকটি হলো দ্বীন এবং তৃতীয়টি হলো জ্ঞান।

নাহজুল বালাগায় আলী (আঃ) এর একঠি বক্তব্য এ রকমঃ হে জনগণ! খোদার কসম খেয়ে বলছি তোমাদেরকে এমন কোনো কিছুর অনুসরণ বা আনুগত্য করার জন্যে বলি না, যা তোমাদের আগে আমি নিজে আমল না করি। আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে জ্ঞানের অলঙ্কার হচ্ছে আমলের মধ্যে। জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলে জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যায় এবং জ্ঞানীজনকে তা সম্মান ও মর্যাদাবান করে। অপরদিকে ধর্মে বারবার যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো- জ্ঞান সেই কাজের মূল্য ও প্রভাব বৃদ্ধি করে যেই কাজ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির আলোয় করা হয়। এ ধরনের কাজের মূল্য, না জেনে করা কাজের তুলনায় শতগুণ বেশি। এ কারণে আলী (আঃ) বলেছেন, জ্ঞানী লোকেরা তাদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অনেক বিষয়ে উপকৃত হন। তিনি বলেছেনঃ

জ্ঞানের সাথে তার ব্যবহারিক প্রয়োগের সম্পর্কটি খুবই নীবিড়। যিনি জ্ঞান অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁর উচিত সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। কেননা জ্ঞান আমলকে আহ্বান জানায়। আমল যদি জ্ঞানের আহ্বানে সাড়া দেয় তাহলে সেই জ্ঞান অক্ষুন্ন থাকে নতুবা তা চলে যায়। তিনি আরো বলেছেন ঈমান-আমল এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন যে জ্ঞান সেই জ্ঞান পার্থিব এই পৃথিবীতে তার অধিকারীর জন্যে সম্মান ও মর্যাদা বয়ে আনে আর পরকালীন জগতের মুক্তি নিশ্চিত করে। এই ধরনের জ্ঞানের অধিকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে। ইমাম আলী (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, কোনো মুমিন যদি মৃত্যুবরণ করে আর তার লেখা একটি পাতাও যদি পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকে যাতে জ্ঞানের কথা লেখা রয়েছে, তাহলে ঐ পাতাটি তার এবং আগুণের মাঝে হিজাব বা পর্দা হিসেবে কাজ করবে।

অন্য এক জায়গায় ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন, জ্ঞানী লোকেরা মাটির অন্তরে শায়িত থাকা অবস্থায় জীবিত, আর মূর্খ লোকেরা মৃত যদিও তারা পৃথিবীর বুকে বাস করছে। ইমাম আলী (আঃ) এভাবেই মানুষকে জ্ঞানের ব্যাপারে বিশেষ করে ঈমান ও আমলযুক্ত জ্ঞানের ব্যাপারে উ□সাহিত করেছেন। জ্ঞানের নগরীতে তাই আমাদের সবারই উচিত প্রবেশ করা এবং সেই নগরীতে প্রবেশ করার একটি দরোজা হলো নাহজুল বালাগা।

মালঞ্চ-১৪

নাহজুল বালাগাতে বিভিন্ন শ্রেণী ও মানুষের উদ্দেশ্যে ইমাম আলী (আঃ) এর ছোট-বড়ো অনেক চিঠি এবং বক্তব্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সুন্দর একটি চিঠি হলো তাঁর আপন সন্তান ইমাম হাসান (আঃ) কে লেখা। সময়ের সঙ্কীর্ণতার জন্যে আমরা সেই চিঠিটি পুরোপুরি হয়তো উপস্থাপন করতে পারবো না। তবে চিঠিটার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ এবং তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আপনারা যথারীতি মালঞ্চের সাথেই আছেন-এ প্রত্যাশা রইলো।

হযরত আলী (আঃ) তাঁর নিজের লেখা চিঠিতে নৈতিকতা সম্পর্কে পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে নিজের সন্তানকে বহু উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পূর্ববর্তীদের জীবনেতিহাস এবং তাদের অতীত ঘটনা পর্যালোচনা করতে হবে। হযরত আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তাদের পতনের কারণগুলো কিংবা সাফল্যের কারণগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রাচীনদের সমাজ জীবনে পরিভ্রমণ করে মানুষ ভালোকে মন্দ থেকে আলাদা করতে শিখবে এবং এভাবে জীবন চলার সঠিক পথ নির্বাচন করতে পারবে।

ইমাম আলী (আঃ) আরো বলেছেন, আমার আগে যাঁরাই গত হয়েছেন তাঁদের সমান জীবন তো আমি যাপন করি নি কিন্তু আমি তাঁদের কর্মগুলো গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি এবং তাদের জীবন কাহিনী খতিয়ে দেখেছি। তাঁদের যেসব অবদান বা সৃষ্টিকর্ম রয়েছে সেগুলো আমি খুব ভালোভাবে দেখেছি। এসব দেখেশুনে তাঁদের সম্পর্কে এতোটাই অবহিত হয়েছি যে, মনে হয় আমি সেই প্রথম ব্যক্তি থেকে শুরু করে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবার সাথেই জীবনযাপন করেছি। আর এভাবে আমি আঁধার থেকে আলোয় ফেরা এবং ক্ষতি থেকে কল্যাণের দিকে পরিবর্তনের উপায়গুলো সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি।

হযরত আলী (আঃ) তাঁর সন্তানকে লেখা পত্রের অন্যত্র লিখেছেন তাঁর দেওয়া উপদেশগুলো থেকে তিনটি বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে। বিষয় তিনটি হলোঃ এক- আল্লাহকে ভয় করা, দুই- ফরজ কাজগুলো আদায় করা এবং তিন- পুণ্যবান এবং তাঁদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণ করা। আলী (আঃ) একইভাবে তাঁর সন্তানের কাছ থেকে চেয়েছেন যে, এই পথ অতিক্রম করার জন্যে সবসময় যেন আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি বলেন- মনে রেখো প্রিয় সন্তান আমার! আমি পছন্দ করি যে- আমার দেওয়া উপদেশগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি যার ওপর আমল করবে তা হলো আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের ওপর এবং রিযিকের ওপর পরিতৃপ্ত থাকা এবং তোমার খান্দানের সচ্চরিত্রবানদের পথে চলা। কেননা তাঁরা তোমার মতোই কখনো আত্মপর্যালোচনা করতে ভোলেন নি এবং অবশেষে যা চিনতে পেরেছেন তাকে কাজে লাগিয়েছেন। পথ অতিক্রম করার আগে অবশ্যই আল্লাহর কাছে সাহায্য ও সাফল্য কামনা করবে এবং একান্তই তাঁর ওপর নির্ভর করবে।

আলী (আঃ) এর চিঠির ধারাহিকতায় আল্লাহর প্রশংসা এবং মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সক্ষমতা ও শক্তির কথা এসেছে। মানুষ যে তার সকল যোগ্যতা ও শক্তি- সামর্থ আল্লাহর কাছ থেকেই পেয়েছে এবং সেজণ্যেই মানুষের উচিত কেবলমাত্র আল্লাহরই ওপর নির্ভর করা। সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই স্মরণ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত বলে আলী (আঃ) উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন, হে প্রিয় পুত্র আমার! মনে রেখো! যিনি মানুষের মৃত্যু নির্ধারণ করেন, তিনি হলেন সেই সত্বা যাঁর হাতে তার জীবন রয়েছে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন সেই সত্বা যিনি মৃত্যু দেন। আর যিনি ধ্বংস করেন তিনিই আবার প্রত্যাবর্তন করাবেন। জেনে রাখো! কাজের পুরস্কারও রয়েছে পরিণাম দিবসে। যখন তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তখন তুমি কিছুই জানতে না। পরে তুমি জানতে শিখেছো। তাই এমন কারো বন্দেগি করা উচিত যে তোমাকে সৃষ্টি করেছে, তোমাকে

প্রতিপালন করেছে, তোমাকে আহার্য দিয়েছে। কেবল তারি বন্দেগি করো এবং তার ওপর নির্ভরতায় অটল থাকো, কেবল তাকেই ভয় করো।

ইমাম হাসান (আঃ) কে লেখা চিঠির অন্য এক অংশে ইমাম আলী (আঃ) পৃথিবী এবং পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে কথা বলেছেন। তারপর একটি উদাহরণ দিয়ে মানুষের মধ্যকার দুটি দলের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। একটি দল হলো যারা নশ্বর এই পৃথিবীকে খুব ভালোভাবে চেনেন এবং জানেন, তাই নিজেদেরকে তাঁরা এই পৃথিবীতে ক্ষণিকের পান্থ হিসেবে মনে করেন। অন্য দলটি হলো যারা পার্থিব এই দুনিয়ার জালে আটকা পড়েন এবং পরিনতিতে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হন। চলুন আমরা বরং ইমাম আলী (আঃ) এর নিজের বক্তব্যটিই সরাসরি শুনি। তিনি বলেছেনঃ

প্রিয় পুত্র আমার! আমি তোমাকে দুনিয়া সম্পর্কে অবহিত করলাম-দুনিয়ার নশ্বরতা সম্পর্কে, দুনিয়ার পরিবর্তন বা রূপান্তর সম্পর্কে। তোমাকে এ-ও জানিয়েছি পরবর্তী জগত সম্পর্কে, মানুষের জন্যে যে জগতটি প্রস্তুত রয়েছে। এ ব্যাপারে তোমার জন্যে এমন কিছু উদাহরণ টানবো যাতে ঐ উদাহরণ থেকে চিন্তা করতে পারো এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারো। এমন একটি ভ্রমণকারী দল রয়েছে যারা এমন একটি ঘর বেছে নেয় এবং সেই ঘরে যাবার জন্যে ভ্রমণের কষ্ট ভোগ করে যাতে কাঙ্খিত সেই ঘরে গিয়ে পৌঁছুতে পারে এবং পরিপূর্ণ সুখ লাভ করতে পারে। এরা পথের কষ্টটাকে কষ্টই মনে করে না এবং সেই ঘরে প্রবেশ করার চাইতে তাদের কাছে বেশি আনন্দায়ক আর কোনো কিছুই নেই।

অন্যদিকে যারা এই পৃথিবীর প্রেমে মুগ্ধ হয়েছে, পার্থিব জগতের ফাঁদে আটকা পড়েছে, তারা হলো সেই দলটির মতো যারা নিয়ামতপূর্ণ স্থান ছেড়ে শুষ্ক-খরা আর পানিহীন, বৃক্ষহীন বিরান এক ভূমির বাসিন্দা হয়। তাদের কাছে সবচেয়ে কষ্টকর এবং অসন্তোষজনক বিষয়টিই হলো সেই ঘরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যে ঘরটিতে একসময় তারা বাস করতো।

মালঞ্চ-১৫

পাঠক! গত আসরে আমরা ইমাম হাসান (আঃ) কে লেখা আমিরুল মুমেনিন আলী (আঃ) এর একটি চিঠি নিয়ে কথা বলেছিলাম। আশা করি আপনাদের মনে আছে। সেই চিঠিতে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। তাই আমরা কথা দিয়েছিলাম যে আজকের আসরেও গুরুত্বপূর্ণ ঐ চিঠিটির আরো কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা ইমামের লেখা চিঠির মাঝে ফিরে যাই।

একটি কথা বহু মনীষীর মুখেই বলতে শোনা যায় যে, যা কিছু তোমার নিজের জন্যে পছন্দ করো তা অন্যদের জন্যেও পছন্দ ক'রো। আর যা কিছু তুমি তোমার নিজের জন্যে পছন্দ করো না, তা অন্যদের জন্যেও ক'রো না। এটা এমন এক নৈতিক বিধান যা প্রত্যেক জাতি-গোত্রের কাছেই সম্মানীয় এবং গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। নিঃসন্দেহে নৈতিকতা এবং সামজিক বিধি-বিধানগুলো মেনে চললে মানুষের ভেতরটা পঙ্কিলতামুক্ত হয় অর্থা অন্তরের ভেতরকার সকল দূষণ বিদূরিত হয়ে যায়, ব্যক্তিকে মানসিক সুস্থতা ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দান করে এবং সমাজে বন্ধুত্ব ও সমঝোতাপূর্ণ একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর এ রকম পরিবেশে একজন মানুষ সঠিক ও যথার্থ জীবন যাপন করতে পারে এবং ব্যক্তি নিজেকে তার কাঙ্খিত মঞ্জিলে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আলী (আঃ) এই নীতিমালা সম্পর্কে তাঁর সন্তান ইমাম হাসান (আঃ) কে উপদেশ দিয়ে বলেছেনঃ প্রিয় পুত্র আমার! নিজেকে অন্যদের সাথে তুলনা করো! তারপর নিজের জন্যে যা কিছু ভালোবাসো তা অন্যদের জন্যেও ভালোবেসো! আর যা কিছু নিজের জন্যে পছন্দ করো না, তা অণ্যদের জন্যেও পছন্দ করো না। কক্ষনো কারো ওপর অন্যায়-অবিচার করবে না কেননা তুমি নিজেও পছন্দ করো না কেউ তোমার ওপর অবিচার করুক। দয়াপরবশ হও কেননা তুমি নিজেও তোমার জন্যে তাই পছন্দ করো। অন্যদের মাঝে যা কিছু খারাপ বা মন্দ বলে মনে করো, তা তোমার মাঝেও মন্দ বলেই মনে করো। যা কিছু তুমি শুনতে চাও না তা কখনোই অন্যদেরকেও বলবে না।

আলী (আঃ) একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সাহসী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কেই তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, তখনি একটি সুন্দর সমাজ সৃষ্টি হবে যখন সেই সমাজের লোকজন একজন আদর্শ মানুষের গুণাবলিগুলোকে নিজর মাঝে লালন করবে এবং তার আলোকে নিজের মাঝে মানবীয় পূর্ণতার বিকাশ ঘটাবে। স্বয়ং ইমাম আলী (আঃ) এর জীবনেও নৈতিক মূল্যবোধের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল, আর সেটাই ছিল তাঁর সাফল্যের মূল শক্তি বা চাবিকাঠি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, ইমাম আলী (আঃ) যুদ্ধের সময় পর্যন্ত শত্রুপক্ষের সাথে শালীন ও ন্যায় আচরণ করার মতো বিনয় ও মহত্ব দেখিয়েছেন। নৈতিকতার উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যের অন্যত্র বলেছেনঃ প্রিয় সন্তান আমার! যারা বেশি কথা বলে তাদের কথা নিরর্থক। যারা চিন্তাভাবনা করে তারা সচেতন ও দৃষ্টিসম্পন্ন। যারা স কর্মশীল তাদের সাথে পরামর্শ করো যাতে তাদের মতো হতে পারো। অস লোকদের পরিহার করে চলো যাতে তাদের অন্তর্ভুক্ত না হও। সুদূর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাগুলো ত্যাগ করো কেননা তা হলো বোকার

সওদা। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাও, সুযোগ হাতছাড়া করার আগে এবং কষ্ট পাবার আগে তাকে গণীমত মনে করো।

এরপর হযরত আলী (আঃ) শত্রুতা এবং বন্ধুত্বের ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বন্ধুকে ভাইয়ের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন। বন্ধুদের সাথে সদাচরণ ও শালীন ব্যবহার করার জন্যে তিনি তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিয়েছেন। আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে মানুষের উচিত সবসময় বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে চলা। ইমামের ভাষায়ঃ প্রিয় সন্তান আমার! তোমার ভাই যদি তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তুমি তার ওপর সদয় হও! সে যদি তোমাকে হিংসা করে তাকে ক্ষমা করে দাও! তোমার বন্ধুর শত্রুকে বন্ধু বানিয়ো না যাতে তোমাকে তোমার বন্ধুর শত্রুতে পরিনত হতে না হয়। তোমার ভাইকে উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তরিক হও। বন্ধুর কাছ থেকে যদি বিচ্ছিন্ন হতে চাও বন্ধুত্বের কিছুটা রেশ নিজের কাছে রেখে দাও। যে তোমাকে চায় না তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না।

নাহজুল বালাগার এইসব বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ইমাম আলী (আঃ) কতোটা মহান এবং উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই বিদগ্ধ মণীষার কারণে এবং মহান মর্যাদার কারণে বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী চিন্তাবিদরাও ইমামের প্রতি শ্রদ্ধায় বিমুগ্ধচিত্ত হয়ে আছেন। ডক্টর যাকি মোবারক বলেছেনঃ আমি বিশ্বাস করি নাহজুল বালাগা পড়ার মাধ্যমে মানুষের পৌরুষ এবং বীরত্বপূর্ণ আত্মা শক্তিশালী হয়। কেননা এই গ্রন্থ এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের হৃদয় নিংড়ানো বাণীর সংকলন, যিনি সর্বপ্রকার বৈরিতা বা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সিংহের মতো দাঁড়িয়েছিলেন।

মালঞ্চ-১৬

পাঠক! আজকের আসরে আমরা নাহজুল বালাগায় কোরআন বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করবো। হাকিম নিশাবুরি থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করবো মালঞ্চের আজকের আসর। রাসূলে খোদা (সা) বলেছেন-আলী কোরআনের সাথে এবং কোরআন আলীর সাথে। কিয়ামত পর্যন্ত কোরআন এবং আলী একে অপরের কাছ থেকে কখনো পৃথক হবে না।

কোরআন হলো মানুষের জন্যে জীবনবিধান সংবলিত একটি ঐশী গ্রন্থ। ইহকাল এবং পরকালে মানবতার মুক্তির জন্যে পথনির্দেশক হিসেবে এই ঐশী গ্রন্থটিকে প্রেরণ করা হয়েছে। কোরআন তাই মূল পথের নীতি-আদর্শের নির্দেশনা দেয়। এই রেখা বা লাইনগুলো হলো এমন

চেরাগের মতো যেই চেরাগের সাহায্যে চলার পথ দেখতে পাওয়া যায়। আর এই পথ দেখানোর ক্ষেত্রে আলী (আ) হলেন নবীজীর পাশাপাশি একজন গাইড।

আলী (আ) সেই ছোটোবেলা থেকেই নবীজীর সাহচর্যে ছিলেন। তিনি নবীজীর ওপর ওহী নাযিলের সাক্ষী। তিনি ছিলেন একাধারে কোরআনের হাফেজ, কোরআনের লেখক, কোরআনের ক্বারী এবং কোরআনের মুফাসসির। ওহীর পরিবেশে প্রতিপালিত হওয়া ছাড়াও নবীজীর জীবদ্দশায় এবং তাঁর পরবর্তীকালেও কোরআন প্রশিক্ষণ, কোরআন লেখা, কোরআন শেখানো ইত্যাদিতে তিনি তাঁর সময়ের একটা অংশ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। এ কারণেই নাহজুল বালাগার বিভিন্ন স্থানে কোরআনের বক্তব্য বা উদ্ধৃতি এসেছে। আলী (আঃ) তাঁর বক্তব্যের একটা অংশে কোরআনের বর্ণনা দিয়েছেন, কোরআনের গুরুত্ব, কোরআনের মর্যাদা এবং সমাজে তার ভূমিকা সম্পর্কেও বলেছেন, অপর অংশে কোরআনের পরিচয় এবং কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

হযরত আলী (আ) কোরআনকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নত মূল্যবোধ সম্পন্ন একটি ধর্মীয় গ্রন্থ বলে মনে করেন এবং তাঁর বক্তব্যে কোরআনের ব্যতিক্রমধর্মী ও অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের জন্যে পুনরায় উল্লেখিত হয়েছে। মানবীয় চিন্তার ওপরে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইমাম আলী (আ) এর দৃষ্টিতে কোরআন নজিরবিহীন এবং অভিনব এক সংকলন যা সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এতে বাতিলের কোনো স্থান নেই এবং প্রাচীনত্বের কোনো আবরণ কোরআনের ওপর পড়ে না। তাকওয়ার ব্যাপারে জনগণকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি আল্লাহর কিতাবকে তুলে ধরেছেন এভাবেঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনকে নবীজীর ওপর নাযিল করেছেন। যে নূরের দীপ্তি কখনো নেভে না। এটি এমন এক চেরাগ যার ঔজ্জ্বল্য কখনো অস্তমিত হয় না। এটি এমন এক মহাসমুদ্র যার গভীরতা অনুভব করা যায় না। কোরআনের পথ এমন এক পথ যে পথে গোমরাহীর কোনো স্থান নেই। এটি এমন এক মশাল যার রশ্মিতে আঁধারের কোনো স্থান নেই। কোরআন হলো সত্য এবং মিথ্যাকে আলাদাকারী। কোরআনের যুক্তপ্রমাণ অকাট্য, তা পরাভূত হয় না। কোরআন এমন এক স্থাপত্য যার পিলারগুলো অক্ষয়-অনড়।

ইমাম আলী (আ) তাঁর বক্তব্যে কোরআনের বহু চিত্র এঁকেছেন এবং কোরআনকে তিনি বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সত্য হলো নিরাময়, সম্মানের উ□স এবং মুক্তির পথপ্রদর্শক। তাঁর যে সাহিত্যিক প্রতিভা রয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর সাহচর্যে থেকে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেছেন সেসবকে তিনি কোরআন ব্যাখ্যার কাজে লাগিয়েছেন। কোরআন

হচ্ছে ঈমান এবং তার মূল খনি, প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্র। কোরআন ন্যায়ের উ□স এবং ন্যায়নীতির বহমান ধারা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনকে জ্ঞানীদের তৃষ্ণা নিবারণকারী, গভীর চিন্তার অধিকারী অন্তরগুলোর জন্যে আনন্দদায়ক বসন্ত এবং পূণ্যবানদের ত□পরতার জন্যে একটি আলোকিত পথ হিসেবে স্থাপন করেছেন।

কোরআনের গভীর আধ্যাত্মিক প্রভাব রয়েছে যা আত্মার গভীরে প্রবেশ করে। কোরআনের আয়াতের মাঝে যে সঙ্গীত বা সুর লুকানো আছে, তা অন্তরে বিশেষ একটা শিল্পসুষমা দেয় যার ফলে অন্তরে প্রশান্তি আসে। এজন্যেই ইমাম আলী (আ) বলেছেনঃ এই কিতাব এমন এক ঔষধ যার প্রয়োগে কোনোরকম রোগের অস্তিত্ব থাকে না। এই কিতাব তাদের জন্যে সম্মান ও মর্যাদার উ□স যারা তাকে মনোনীত করে। যারা কোরআনের মাঝে ডুবে যায় তাদের জণ্যে কোরআন হচ্ছে নিরাপদ স্থান। কোরআন তাদের মুক্তিদাতা যারা কোরআন অনুযায়ী আমল করে।

হযরত আলী (আ) হলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাঁর সকল সম্মান ও মর্যাদা কোরআনের মাধ্যম বা ছায়াতেই অর্জিত হয়েছে। তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়েই রয়েছে কোরআনের বাণীর প্রভাব। এ কারণেই তিনি চেষ্টা করেছেন, মানুষকে হেদায়েতের এই উ□সটির সাথে পরিচয় করাতে। নাহজুল বালাগায় তিনি বলেছেন, "কোরআন তোমাদের হাতের নাগালে রয়েছে। শিক্ষণীয় এবং উপদেশময় এই গ্রন্থটিকে তোমাদের কর্মসূচি প্রণয়নকারীরূপে গ্রহণ করো।" তিনি আরো বলেছেন কোরআনের বর্ণনা থেকে অর্জন করে উপকৃত হও। কোরআনের উপদেশগুলো শোনো এবং সেগুলোকে গ্রহণ করো। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, তিনি তোমাদের ওপর সকল আপত্তিকর পথকে বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাঁর হুজ্জাতকে তোমাদের ওপর সম্পন্ন করে দিয়েছেন।

আলী (আ) এর দৃষ্টিতে কোরআনের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ দুটি দিক রয়েছে। কোরআনের বাহ্যিক দিকটি আকর্ষণীয় এবং বিস্ময়কর। কিন্তু কোরআনের পরোক্ষ দিকটি এতোবেশি শেকড়ময় যে, মানুষ যতো গভীর চিন্তার অধিকারীই হোক না কেন, কোরআনের গভীরতা উপলব্ধি করার যোগ্য নয়। তবে যতো বেশি কোরআন নিয়ে চর্চা করবে ততো বেশি কোরআন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। সেজন্যেই ইমাম আলী (আ) সবাইকে কোরআন চর্চার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কোরআন চর্চাকে তিনি পরহেজগার এবং পুণ্যবানদের বৈশিষ্ট্যাবলির একটি বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, যারা কোরআনের আত্মা থেকে দূরে তারা সবসময়ই মুখাপেক্ষী। মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্যে বা সমাজের

সংকটগুলো দূর করার জন্যে কোরআনই যথেষ্ট। তো পাঠক! আসরের সময় ফুরিয়ে এসেছে। এখানেই বিদায় নিতে হচ্ছে। আগামী আসরে আবারো কথা হবে। তখনো আপনাদেরকে মালঞ্চের সাথে পাবো-এ প্রত্যাশা রইলো। যারা সঙ্গ দিলেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

মালঞ্চ-১৭

পাঠক! নাহজুল বালাগার অনুবাদক, বিখ্যাত কবি ও লেখক জনাব নাসের আহমাদ যাদেহ'র বক্তব্য দিয়ে শুরু করবো আজকের আসর। গতবছর জনাব নাসের আহমাদ যাদেহ'র অনূদিত নাহজুল বালাগাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝে বছরের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে মনোনীত হয়েছিল। জনাব আহমাদ যাদেহ বলেছেনঃ আমি প্রজ্ঞা ও প্রেমের অন্বেষণে ছিলাম। আমাকে নাহজুল বালাগার সুস্পষ্ট অনুপ্রেরণা তার সিক্ত তরঙ্গের বিভিন্ন তীরে টেনে নিয়ে গেছে। বাস্তবতা হলো এই যে, আলী (আ) আমাকে মহান এক ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আর আমি জানতাম যে নাহজুল বালাগা হলো একটি জীবনের গ্রন্থ। নাহজুল বালাগার চিন্তা-চেতনাগুলো জীবনের প্রয়োজনেই এসেছে। এই বই মানুষকে শিল্পগুণে গুণান্বিত মানুষ হবার চিত্র আঁকে অর্থা অসম্ভব কার্যকলী একটি বই এটি। নাহজুল বালাগা পড়ে উজ্জীবিত হওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত।

পরহেজগারীতা এমন একটা বিষয় যে ব্যাপারে আল্লাহর সকল নবী-রাসূলই মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো মানুষের পারস্পরিক সম্মান-মর্যাদার উচ্চতর উস হলো একমাত্র পরহেজগারীতা। আলী (আ) ও নাহজুল বালাগায় পরহেজগারীতার মতো আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদনের শ্রেষ্ঠ এই মাধ্যমটি নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি সবসময়ই আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন। এক বক্তিতায় তিনি বলেন আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ রঅধিকার আদায়ে তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ হলেন মহান এবং সর্বশক্তিমান। তাঁর সিপাহীরা অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই আল্লাহকে ভয় করো এবং তাকওয়াবান হও।

মানুষ যদি তার অভ্যন্তরে আত্মিক এবং আধ্যাত্মিকতার অবস্থাকে লালন করে এবং আভ্যন্তরীণ শক্তির ওপর অভিজ্ঞ হয়, তাহলে সে যে কেবল গুনাহর দিকেই ধাবিত হবে না-তাই নয়, বরং তার নিজের ওপর যে আত্মনিয়ন্ত্রণ রয়েছে, সেই শক্তি ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং সেই শক্তি আত্মাকে শক্তি যোগায়। আর এই শক্তিটাই হলো পরহেজগারীতা। আলী (আ) সকল মানুষের উদ্দেশ্যে বলেছেনঃ হে আল্লাহর বান্দারা! তোমাদেরকে আল্লাহর তাকওয়ার

দিকে আহ্বান জানাই। তাকওয়া হলো কিয়ামতের সফরের পাথেয়। পরহেজগারীতা এমন এক পাথেয় যা মানুষকে তার মঞ্জিলে মকসুদে অর্থা কাঙ্খিত গন্তব্যে নিয়ে যায়। তাকওয়া এমন এক আশ্রয়স্থল যেখানে সবাই নিরাপদ।

অনেকে মনে করেন যে তাকওয়া বোধ হয় নির্দিষ্ট একটা শ্রেণীর মানুষের জণ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ প্রকৃত সত্য হলো পরহেজগারীতা হলো ব্যক্তির সৌভাগ্যবান হবার নেপথ্য শক্তি। পরহেজগারীতা মানুষকে ক্ষণিকের ভোগ-বিলাস থেকে দূরে রাখে যাতে সে তার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে। সে একধরনের ছাত্রের মতো যে কিনা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে তার বহু ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দেয়। জ্ঞানান্বেষি যদিও নিজেকে কিছু কিছু জিনিসের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলে এবং সর্বান্তকরণে সে বেশি বেশি জানার পেছনেই পড়ে থাকে। তার এই সীমাবদ্ধতা কিন্তু তারি নিজস্ব উন্নতির সোপান।

ব্যাপারটা এমন যে, তাকওয়াবান মানুষকে সুস্থ চিন্তা ও সুস্পষ্ট লক্ষ্যের অধিকারী ব্যক্তি হিসেবে মনে করা হয়। আলী (আ) এর ভাষায় নফসের লাগাম তার নিজ হাতে রয়েছে। এ কারণে আলী (আ) পরহেজগারীতাকে নফসের সম্মান ও মুক্তির কারণ বলে মনে করেন। নাহজুল বালাগায় তিনি বলেছেনঃ তাকওয়া হলো কিয়ামতের যথার্থ সঞ্চয় এবং উপযুক্ত চাবি। সর্বপ্রকার গোলামি থেকে মুক্তির উপায়। সকল প্রকার দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তির পথ। তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষ তার নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে, শত্রু থেকে রেহাই পায় এবং নিজস্ব ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবায়িত করতে পারে।

পরহেজগারীতা মানুষের অন্তরাত্মায় পুণ্য ও কল্যাণকামী চিন্তার বিকাশ ঘটায়। আলী (আ) এর মতে যাঁরা এই পথে পা ফেলেন তাদের সংখ্যা খুবই কম। কেননা নাহজুল বালাগার বিভিন্ন স্থানে আমরা আমিরুল মুমেনিনের আহ্বান লক্ষ্য করবো। তিনি চেয়েছেন, মানুষ নিজেকে পরহেজগারীতার আলোকে সমৃদ্ধ করুক। অন্তরকে যেন তারা পরহেজগারীতার চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়। তিনি বলেছেন পরহেজগার ব্যক্তিকে সমাজে উচ্চ মর্যাদাবান ও সম্মানীয় মনে করতে হবে। কেননা তাঁরা কল্যাণ ও বিনয়ের পথ অতিক্রম করে।

আলী (আ) বলেছেন, পরহেজগারীতার বিষয়টি মনে রেখো! পার্থিব জগত থেকে পবিত্র থেকো। পরকালীন সাক্ষাতের ব্যাপারে আকর্ষণ বোধ করো। যারা তাকওয়া অর্জনের মধ্য দিয়ে উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছে, তাদেরকে হীন মনে করো না। আর দুনিয়া যাদেরকে উচ্চাসনে স্থাপিত করেছে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদাবান ভেবো না। অন্যত্র তিনি মুত্তাকিনদের বাহ্যিক আকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাওকয়া ও পরহেজগারীতার সুস্পষ্ট নিদর্শন

দেখিয়ে দিয়েছেন। আগামী আসরে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে আরো কথা বলার চেষ্টা করবো। তখনো আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন-এ প্রত্যাশা রইলো।

-চলবে